রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন?

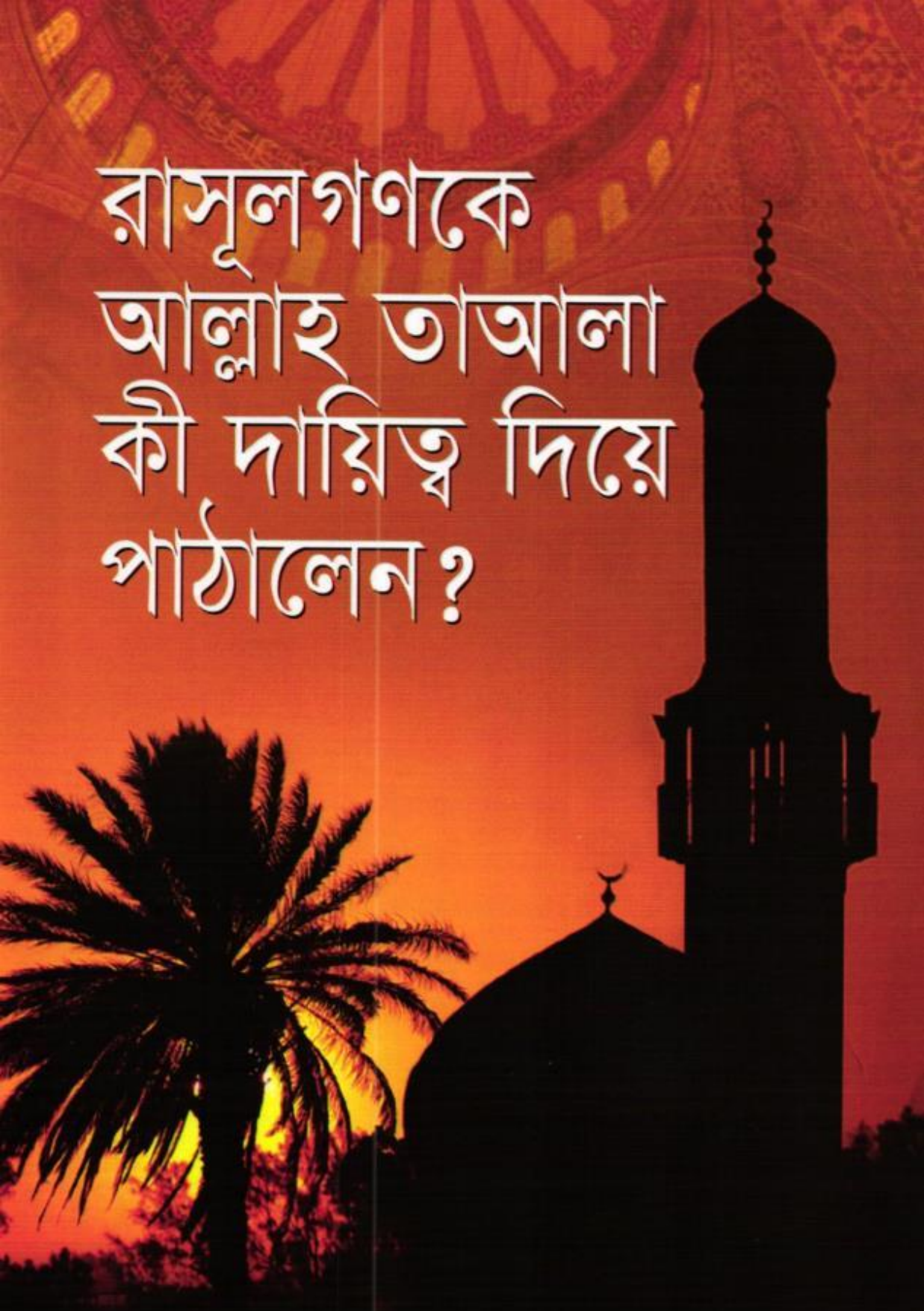

অধ্যাপক গোলাম আযম

রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.amarboi.org

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৭

রাসূলগণকে আল্লাহ্ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন ◆অধ্যাপক গোলাম আযম ◆ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি (৮ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ◆স্বত্ব: লেখক ◆প্রচ্ছদ: কামিয়াব কম্পিউটার ◆ মুদ্রণ: জননী প্রিন্টার্স প্রিন্টার্স, ১৯ প্রতাপ দাস লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

www.kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০

৪২৩ ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১

৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড (৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২

কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য: দশ টাকা মাত্র

www.amarboi.org

এ বইটির উদ্দেশ্য

আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে লাখ লাখ আলেম আছেন। তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে আল্লাহর দীনের খিদমত করে যাচ্ছেন। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, ওয়ায ইত্যাদি মাধ্যমে তারা দীনের মূল্যবান খিদমতে আত্মনিয়োগ করে আছেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা শুধু এ জাতীয় খিদমতের দায়িত্ব দিয়েই রাসূলগণকে পাঠাননি। দীনকে বিজয়ী বা কায়েম করার দায়িত্ব দিয়ে তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন। বর্তমানে সকল বাতিল দীনের উপর আল্লাহর একমাত্র হক দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব পালন না করার কারণেই বাতিল শক্তি বিজয়ী হয়ে আছে। আলেমসমাজ দীনের খিদমতকেই যথেষ্ট মনে করছেন এবং দেশের শাসনক্ষমতা বেদীনদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই দেশে মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসন চলছে এবং জনগণ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ-যাতনা ভোগ করছে।

সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, সকল রাসূলের সাথেই তিনি কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে জনগণ ইনসাফ পায়। আর ইনসাফ কায়েম করার জন্য শাসনশক্তি হস্তগত করে আল্লাহর কিতাবকে বাস্তবায়ন করতে হবে– এটাই এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়।

এ কাজটি সব ফরযের বড় ফরয। এ প্রধান ফরযটি কায়েম করা হলে আল্লাহর অন্য সকল ফরযই সহজে কায়েম হতে পারে। আসল ফরযটি কায়েম না থাকায় আর কোনো ফরযই বাস্তবে ফরযের পজিশনে নেই। নামায-রোযা সমাজে ফরযের মর্যাদায় নেই, মুবাহ অবস্থায় আছে— যার ইচ্ছা নামায-রোযা করে। দীন বিজয়ী থাকলে নামায-রোযা ফরয হিসেবে কার্যকর থাকত।

সব ফরযের বড় ফরযটি কায়েমের দায়িত্ব শুধু আলেম সমাজের নয়; যারাই নিজেদের মুসলিম দাবি করে তাদের সবার উপর এ দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকলকে এ দায়িত্ববোধ দান করুন। এ দায়িত্ববোধ সৃষ্টির জন্যই এ বইটি রচিত হলো।

গোলাম আযম
জেদ্দা, সৌদি আরব
১৫ সফর, ১৪২৮
৫ মার্চ, ২০০৭

www.amarboi.org

সূচিপত্র

রাসূলগণকে আল্লাহ্ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? ৫

একটি আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ৫

রাসূলগণের স্পষ্ট প্রমাণ কী? ৬

প্রত্যেক রাসূলের নিকটই কিতাব পাঠিয়েছেন ৮

মীযানের ব্যাখ্যা ১০

কিতাব ও মীযান নাযিলের উদ্দেশ্য ১০

মানবাধিকার নির্ণয়ের দায়িত্ব কার? ১০

মানবজাতির বৃহত্তম সমস্যা ১২

কিতাব ও মীযান কীভাবে কায়েম হবে? ১২

শাসনক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ১৩

বিশ্বে মানবাধিকারের বাস্তব অবস্থা কী? ১৪

সব রাসূলের যুগে কেন কিস্ত কায়েম হয়নি? ১৫

সাফল্য লাভের জন্য দুটো শর্ত ১৫

আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা ১৬

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন?

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা মহান আল্লাহ তিনটি সূরায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

'তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র দীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সব দীনের উপর বিজয়ী করেন।' (সূরা তাওবা : ৩৩, সূরা ফাত্হ : ২৮ ও সূরা সফ্ : ৯)

সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন বিশিষ্ট রাসূলের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে দীন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ ـ

'তিনি তোমাদের জন্য দীনের ঐসব নিয়ম-কানুনই ঠিক করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন ও যা আমি (হে রাসূল!) এখন আপনার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি এবং যার হেদায়াত আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদসহ দিয়েছিলাম যে, এ দীনকে কায়েম করুন।'

এ দুটো আয়াতে রাসূলগণকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা দুটো পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যায়, দুটো কথার মর্ম একই— দীন বিজয়ী হলেই কায়েম হলো। আর দীন কায়েম হলেই বিজয়ী হলো। রাসূলগণকে দীন কায়েম বা বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে। দীন কায়েম বা বিজয়ী হলে এর বাস্তব রূপ কী হবে এবং এর ফলাফল কীরূপ হবে এ বিষয়ে এ দুটো আয়াতে স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি।

একটি আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

কুরআন মাজীদের সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে সকল রাসূল সম্পর্কে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাদের কী কী হাতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং মানবসমাজে শান্তি কায়েমের জন্য তাদের উপর কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐ দায়িত্ব পালনের পন্থা-ই বা কী এবং ঐ দায়িত্ব পালনের ফলে মানুষ

www.amarboi.org

কীভাবে ন্যায় ও ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। একই আয়াতে সকল রাসূল সম্পর্কে এমন গুরুত্বপূর্ণ এত কথা আর কোনো আয়াতে পাওয়া যায় না। তাই এ আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

প্রথমে আয়াতটি উদ্ধৃত করছি :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

'আমি আমার রাসূলগণকে প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহসহ এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। আমি লোহাও নাযিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখেও তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী।'

এ মহাতাৎপর্যপূর্ণ আয়াতটির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা পেশ করছি :

রাসূলগণের স্পষ্ট প্রমাণ কী?

আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে রাসূল হিসেবে দুনিয়ায় দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁদেরকে যাতে মানুষ সহজেই চিনে নিতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে এমন কতক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যাতে অন্য সব মানুষ থেকে তাঁদেরকে নির্দিষ্টভাবে চিনে নিতে বেগ পেতে না হয়। আমরা মোট চারটি বৈশিষ্ট্য প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

প্রথম প্রমাণ, উন্নততর বংশ-পরিচয়। প্রত্যেক রাসূলকে সেরা বংশে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা এমন উচ্চবংশে জন্ম নিয়েছেন, যার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা পোষণ করে। কোনো রাসূলই নিম্নমানের বংশে জন্মগ্রহণ করেন নি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর শেষ রাসূল (স) পর্যন্ত সকলেই তাঁর বংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে কতক সাহাবী অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর অনুমতি নিয়ে হাবশায় (ইরিত্রিয়ায়) হিজরত করেন। সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁদেরকে আশ্রয় দান করেন। কুরাইশ সর্দার আবূ সুফিয়ান তাঁদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হয়ে বলেন যে, এই লোকগুলো ধর্মদ্রোহী। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে তারা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। নাজ্জাশী আবূ সুফিয়ানকে মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে কতক প্রশ্ন করে তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চান। প্রথম প্রশ্নই ছিল তাঁর বংশ-পরিচয়। আবূ সুফিয়ান স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ (স) মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। বাদশাহ বললেন, নবী-রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই সৃষ্টি হন। সব প্রশ্নের

www.amarboi.org

জবাব শুনে বাদশাহ নিশ্চিত হলেন যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। তাই তিনি আবূ সুফিয়ানের হাতে তাঁদের তুলে দিতে অস্বীকার করে তাঁর আশ্রয়েই রেখে দিলেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ, আকর্ষণীয় চেহারা। রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা এমন আকর্ষণীয় চেহারা দিয়েছেন যে, তাদেরকে দেখলে ভালো না বেসে পারা যায় না। হযরত মূসা (আ) শিশু অবস্থায় নদীতে ভেসে যখন ফিরাউনের ঘাটে এসে পৌছলেন, তখন ফিরাউন ও তার স্ত্রী শিশুর চেহারা দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে, বনী ইসরাঈলের কোনো সন্তান হতে পারে বলে সন্দেহ করে খোঁজ-খবর নেওয়ার হুঁশই তাদের রইল না। তারা শিশুটিকে আদর করে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে গেল। মুহাম্মদ (স)-এর ধাত্রীমাতা হালিমা ও তাঁর স্বামী মক্কার কোনো ধনী পরিবারের শিশু না পেয়ে গরীব আবদুল মুত্তালিবের নাতি ও আমিনার শিশুপুত্রকেই অসন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। কিন্তু যখন দুজনই শিশুটির চেহারা দেখলেন, তখন তাঁদের অন্তরে স্নেহের বন্যা বয়ে গেল এবং অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন।

তৃতীয় প্রমাণ, নির্মল চরিত্র। আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন, তাঁরা ওহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত নিজেরা জানতে পারেন না যে, তাঁরা রাসূল। কিন্তু জন্ম থেকেই আল্লাহর নিকট রাসূল হিসেবে গণ্য এবং তাদেরকে সে হিসেবেই গড়ে তোলা হয়। তাঁদের স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এমন উন্নত ও আকর্ষণীয় যে, সমাজের সকলেই তাদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। নবুওয়াত লাভের অনেক আগেই মুহাম্মদ (স) আল আমীন ও আস্ সাদিক উপাধিতে ভূষিত হন। সমাজের চরিত্রহীন লোকেরাও উন্নত চরিত্রবান লোককে শ্রদ্ধা করে। মিথ্যাবাদীও সত্যবাদীর প্রশংসা করে।

রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ (স)-এর পরিচয় শুরু হওয়ার পূর্বেই একটি ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, মক্কার সকল নেতাই এ মানুষটিকে সমাজের সেরা মানুষ বলে স্বীকার করত। কাবাঘর মেরামত করার পর বিখ্যাত কালো পাথরটি যথাস্থানে কে স্থাপন করবে এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। যে স্থাপন করবে সে-ই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বলে গণ্য হবে। তাই এ সম্মানের জন্য সকল নেতাই লালায়িত হলো। শেষ পর্যন্ত সবাই মীমাংসার একটা উপায়ে একমত হলো। আগামী ভোরে সবার আগে যে ব্যক্তি কাবা শরীফে আসবে, এ বিষয়ে মীমাংসার ভার তাকে দেওয়া হবে। ঘটনাক্রমে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ (স) সেখানে পৌছলেন। সকল নেতা একবাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করল যে, সবচেয়ে উপযুক্ত লোকই পাওয়া গেল।

কী কারণে এ মানুষটির শ্রেষ্ঠত্ব সব নেতারাই স্বীকার করে নিল? তাঁর সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, আমানতদারী, নির্মল চরিত্র, প্রশংসনীয় আচরণ ও উন্নত মানবীয় গুণাবলির কারণেই তাঁর প্রতি সকলের আস্থা সৃষ্টি হয়।

তিনি পবিত্র কালো পাথরটি নিজ হাতে তুলে একটি চাদরের উপর রাখলেন এবং সকল নেতাকে চাদরের চারপাশে ধরে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সবাই পাথরটি বহন করতে সমানভাবে শরীক হতে পেরে অত্যন্ত খুশি হলো। যথাস্থানে

www.amarboi.org

পৌঁছার পর তিনি চাদর থেকে পাথরখানা তুলে কাবাঘরের কোণে স্থাপন করলেন। সবশেষে যে কাজটি তিনি করলেন এ সম্মানজনক কাজটুকু করার জন্যই তো নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলল। মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর কোনো একজন এ কাজটি করলে আর কেউ তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এ সম্মানজনক কাজটি যিনি করলেন, তাতে কেউ আপত্তি করল না।

এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ যখন নিজেকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে বললেন, তখন ঐ নেতাদের আপত্তি করা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না।

নবুওয়াতের তৃতীয় বর্ষে তিনি সাফা পাহাড়ের উপর চড়ে মক্কাবাসীকে যখন ডাকলেন, তখন সব নেতাসহ জনগণ হাজির হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি বলি যে, এই পাহাড়ের পেছনে একদল শত্রু তোমাদের উপর হামলা করতে এগিয়ে আসছে, তাহলে কি আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে? নেতারাসহ সবাই বলল, তুমি বললে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ আমরা কোনো সময় তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তাঁর সম্পর্কে সবার এমন সুধারণার কারণে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি তখন যে দাওয়াত দিলেন তা কবুল করা। কিন্তু প্রধান নেতাদের প্রায় সবাই সে দাওয়াতে সাড়া দিতে অস্বীকার করল।

চতুর্থ প্রমাণ, ওহীর জ্ঞান। উপরিউক্ত তিনটি প্রমাণই কোনো ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে চিনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঐ তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি নিজেকে রাসূল হিসেবে দাবি করলে তা বিবেচনা না করে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া স্বাভাবিক ছিল না; কিন্তু যারা হঠধর্মী ও কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী, তারা চতুর্থ ও চূড়ান্ত প্রমাণকে পর্যন্ত অস্বীকার করল।

মুহাম্মদ (স) ৪০ বছর বয়সে ওহীর জ্ঞান লাভ করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় এমন উন্নত ভাবসম্পন্ন বাণী পেশ করলেন, যা তাঁর মুখ থেকে পূর্বে কখনো শোনা যায়নি। একই মুখ থেকে স্পষ্ট দু মানের ভাষা শোনার পর ভিন্ন মানের ভাষায় উচ্চারিত বাণী শুনে তাঁকে রাসূল হিসেবে চিনতে আর কোনো প্রমাণেরই প্রয়োজন ছিল না।

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণকে সুস্পষ্ট চার প্রকার প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহসহ পাঠিয়েছেন।

প্রত্যেক রাসূলের নিকটই কিতাব পাঠিয়েছেন

সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, সকল রাসূলের নিকটই কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কুরআনে যেমন সকল রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি সকল কিতাবের নামও ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু কিতাব ছাড়া কোনো রাসূল পাঠানো হয়নি। এমনও হতে পারে যে, কোনো কোনো রাসূলের নিকট একাধিক কিতাবও নাযিল করা হয়েছে।

সর্বশেষ কিতাব ছাড়া পূর্ববর্তী তিনটি কিতাবে নাম কুরআনে উল্লেখ থাকলেও কোনোটিই মূল ভাষায় অবিকৃত অবস্থায় নেই। অন্যান্য কিতাবের নাম পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার কথা উল্লেখ থাকলেও এর নাম কুরআনে নেই।

www.amarboi.org

মীযানের ব্যাখ্যা

সূরা হাদীদের এ আয়াতে কিতাব নাযিলের সাথে মীযান নাযিলের কথাও বলা হয়েছে। মীযান শব্দের অর্থ হলো দাঁড়িপাল্লা। জিনিস ওজন করার জন্য যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয় সে অর্থ এখানে গ্রহণ করা একেবারেই অযৌক্তিক। আল্লাহর কিতাবের সাথে দাঁড়িপাল্লার সম্পর্ক থাকা অর্থহীন। কিতাব নাযিলের সাথে মীযান নাযিল মানে বস্তু দাঁড়িপাল্লা হতে পারে না। তাছাড়া প্রত্যেক রাসূলের নিকট কিতাব নাযিল করার সময় বস্তু দাঁড়িপাল্লাও নাযিল করা স্বাভাবিক হতে পারে না।

এখানে দাঁড়িপাল্লা শব্দটি ভারসাম্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূরা রাহমানের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ

এর অর্থ "তিনি আসমান উঁচু করেছেন এবং ভারসাম্য কায়েম করেছেন।' এখানে মীযান মানে দাঁড়িপাল্লা নয়।

দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ঠিক ঠিক ওজন করা যায় এবং সঠিকভাবে পরিমাপ করা হয়। বাটখারার সমান ওজনে পণ্য দিলে ন্যায়মতো দেওয়া হয়। এ থেকেই দাঁড়িপাল্লা গোটা বিশ্বে ন্যায় বা ইনসাফের প্রতীক। ঢাকার সুপ্রিম কোর্টের বিল্ডিং-এ এ প্রতীক এঁকে দিয়ে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ আদালতে আইনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সকলের অধিকারই ন্যায়মতো দেওয়া হয়।

আল্লাহ তাআলা রাসূলের নিকট যে কিতাব নাযিল করেন তা জনগণকে তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেই রাসূলের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। উক্ত আয়াতে মীযান মানে কিতাবের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। যার যেমন খুশি কিতাবের ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিলে সঠিক ব্যাখ্যা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তারা ভারসাম্যহীন ব্যাখ্যা করলে কিতাবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কিতাবের সঠিক অর্থ জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাসূলকেই দিয়েছেন। রাসূলই কিতাবের সরকারি ব্যাখ্যাতা। রাসূল নিজে মনগড়া ব্যাখ্যা করেন না; ওহী দ্বারা যে ব্যাখ্যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দেন, সে ব্যাখ্যাই তিনি করেন।

কুরআনের কয়েকটি সূরাতে মোট চারটি আয়াতের প্রত্যেকটিতে রাসূলের চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ ও সূরা জুমুআর ২নং আয়াতে ঐ চারটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা জুমুআর আয়াতটি হলো–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

'তিনিই সে সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।'

www.amarboi.org

এ দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহর কিতাব একজন পিওনের মতো মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে রাসূলকে পাঠানো হয় না; রাসূলের দায়িত্ব হলো কিতাব তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেওয়া, কিতাবের অর্থ শিখিয়ে দেওয়া, কিতাবের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনের হিকমত শিক্ষা দেওয়া ও কিতাবের শিক্ষার বিরোধী সব কিছু থেকে জনগণের জীবনকে পবিত্র করা।

এ কাজগুলো রাসূল (স) ভারসাম্যপূর্ণভাবে সমাধা করেছেন। কিতাব ওহীয়ে মাতলূর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। আর কিতাবের সরকারি ব্যাখ্যা ওহীয়ে গাইরে মাতলূর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, মীযান মানে রাসূলের সুন্নাহ। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ সবটুকুই ওহী।

কিতাব ও মীযান নাযিলের উদ্দেশ্য

ঐ আয়াতে মাত্র তিনটি শব্দে কিতাব ও মীযান নাযিলের উদ্দেশ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে, لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ যাতে মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। এখানে 'কিস্‌ত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে একই অর্থে عَدْلٌ শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজিতে Justice শব্দ যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে আরবী قِسْطٌ শব্দটিও তেমনি ব্যাপক অর্থবোধক। বাংলায় ন্যায়সঙ্গত বলা যায়। যা সঠিক, যথার্থ, যা উচিত ইত্যাদি কথায়ও কিস্‌ত ও আদ্‌ল-এর অর্থ প্রকাশ করা যায়।

ইনসাফ বা ন্যায় মানে সমান সমান হওয়া বোঝায় না। সব মানুষের প্রয়োজন সমান নয়; যার যা প্রয়োজন তা পূরণ হলেই মানুষ সন্তুষ্ট হয়। কোলের শিশুর ও যুবকের প্রয়োজন একই রকম নয়। মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা সমান বটে; কিন্তু প্রয়োজন সমান নয়।

সব মানুষই শান্তি পেতে চায়। যার যা প্রয়োজন তা পেলেই শান্তি ভোগ করে, না পেলে অশান্তি ভোগ করে। অভাবই অশান্তির মূল। যা দরকার তা পেলে অভাব থাকে না।

মানবাধিকার পরিভাষাটি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন পরিভাষা। যার যা অধিকার তা পেলেই মানুষ সুখি হয়। নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার, জনগণের অধিকার নিয়ে বিশ্বে এত ব্যাপক চর্চা কেন হচ্ছে? যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত তারাই অশান্তিবোধ করে। প্রত্যেকেই তার ন্যায্য অধিকার পেলে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে দেশে সকল অশান্তির মূলেই মানবাধিকার থেকে বঞ্চনা। তাহলে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কিস্‌ত, আদল, ইনসাফ ও ন্যায় মানে সকল মানুষের অধিকার পাওয়া। সুখ-শান্তি উপভোগ করার জন্য যার যা প্রয়োজন, তা-ই তার অধিকার।

মানবাধিকার নির্ণয়ের দায়িত্ব কার?

দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে কার কী অধিকার তা নির্ণয় করা বিরাট ব্যাপার। কোনো মানুষের পক্ষে কি তা নির্ণয় করা সম্ভব? সে মানুষটি কে, তা কীভাবে জানা যাবে? সে

www.amarboi.org

মানুষটি কোন্ যুগের? কোন্ দেশের? মানবাধিকার কি বিশ্বজনীন নয়? বিশ্বের সকলের অধিকার নির্ণয় করার সাধ্য কি কোনো মানুষের হতে পারে? কোনো মানুষের উপর এ দায়িত্ব দিলে সে কি নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রতি সুবিচার করতে পারবে? কোনো ব্যক্তি বা কোনো পার্লামেন্টকে এ দায়িত্ব দিলে সে বা তারা নিজেদের অধিকারই বেশি করে নির্ধারণ করতে পারে। এক দেশের মানুষ যা নির্ণয় করবে, অন্য দেশের মানুষ তা মেনে নিতে বাধ্য নয়। রাষ্ট্রসংঘ বা জাতিসংঘ যে মানবাধিকার সনদ প্রণয়ন করেছে, তাতে সকল রাষ্ট্রের সম্মতি থাকায় সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন হওয়ার মর্যাদা পেতে পারে বটে; কিন্তু পবিত্র সিদ্ধান্ত হিসেবে এমন ভক্তি-শ্রদ্ধার মর্যাদা পেতে পারে না, যেমন বিশ্বস্রষ্টার বিধান পেয়ে থাকে।

মানবাধিকার নির্ধারণের জন্য এমন নিরপেক্ষ সত্তা প্রয়োজন, যিনি কোনো পক্ষ নন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিজেও একটা পক্ষ। এর সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। জাতিসংঘ সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার স্বীকার করে না।

তাই একমাত্র বিশ্বস্রষ্টাই এমন নিরপেক্ষ এক মহান সত্তা, যার কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা স্বাভাবিক নয়। জাতিসংঘে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা তো Divine Guidance-এর ধারই ধারেন না। তাই তারা অবিরাম মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছেন।

যত আইন রচনা করা হয়, তা মানবাধিকারই নির্ণয় করে। তাই আল্লাহ তাআলা আইন রচনার ক্ষমতা তাঁর হাতেই রেখেছেন। নবী-রাসূলকেও আইন রচনা করা বা মানবাধিকার নির্ধারণ করার ইখতিয়ার দেননি। তাঁর রচিত আইনের অধীনে অবশ্য মানুষকেও প্রয়োজনীয় আইন রচনার অধিকার দিয়েছেন। তাঁর আইনের বিরোধী কোনো আইন রচনার অধিকার কারো নেই।

মানবাধিকার যদি স্রষ্টার দেওয়া বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা এমন পবিত্র মর্যাদার অধিকারী হবে, যা মেনে চলা কর্তব্য বলে বিশ্বাস জন্মিবে। বিশেষ করে যেখানে মানুষ পরস্পর আবেগময় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, সেখানে এক সময় একজনের অধিকার খুশি হয়ে দিলেও, আরেক সময় কোনো অধিকারই দিতে চায় না। যেমন স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার, পিতামাতা ও সন্তানের অধিকার। যখন সম্পর্ক মধুর থাকে তখন অধিকার দেয়; কিন্তু সম্পর্ক খারাপ হলে কোনো অধিকার দেয় না।

অধিকার কথাটিতে বোঝা যায় যে, দুটো পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষের যা অধিকার তা অপর পক্ষের কর্তব্য। স্বামীর যা অধিকার তা-ই স্ত্রীর কর্তব্য এবং স্ত্রীর যা অধিকার তা স্বামীর কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই নিজ নিজ কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি উভয়েই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে তাহলে উভয়েই তাদের অধিকার পেয়ে যাবে; কিন্তু যদি তারা কর্তব্য পালন না করে কেবল নিজ নিজ অধিকারই দাবি করতে থাকে, তাহলে কেউ তার অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাবে না। পিতামাতা ও সন্তান, শ্রমিক ও মালিক, ছাত্র ও শিক্ষক, জনগণ ও সরকার ইত্যাদি দুটো পক্ষ। তাদের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এ অধিকারের তালিকা

www.amarboi.org

অপর পক্ষের উপর যে কর্তব্য আরোপ করে, তা পালনের গুরুত্ব সকল পক্ষকেই উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহর প্রণীত মানবাধিকার হাসিলের যে পদ্ধতি তিনি দিয়েছেন, এর সঠিক প্রয়োগ ব্যতীত অধিকার ভোগ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহর কিতাব ও মীযানই যথার্থ, নিরপেক্ষ ও নির্ভুলভাবে মানবাধিকার নির্ণয় করে দিয়েছে। আর কারো পক্ষে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

মানবজাতির বৃহত্তম সমস্যা

ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, সকল মানুষের অধিকার ভোগ করার সুব্যবস্থা করার অক্ষমতাই মানবজাতির জীবনে সর্বাপেক্ষা বড়, কঠিন ও জটিল সমস্যা। অথচ এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার আসল উদ্দেশ্যই মানবাধিকার নিশ্চিত করা। যে রাষ্ট্র ও সমাজে এ উদ্দেশ্য সফল করার প্রচেষ্টা চলে না, তা অসভ্য ও বর্বর সমাজ হিসেবেই গণ্য। কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ যদি সভ্য বলে দাবি করতে চায়, তাহলে তাকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব দিতেই হবে। এ ব্যাপারে যে রাষ্ট্র যত অগ্রসর, সে রাষ্ট্রই তত সভ্য বলে স্বীকৃতি পায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতাই আধুনিক বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নই এ সভ্যতার পতাকাবাহী। তারা নিজ নিজ দেশেও সব মানুষের সমধিকার নিশ্চিত করছে না। তবুও তারা নিজ দেশে যেটুকু মানবাধিকার স্বীকার করে, ততটুকুও মুসলিম দেশসমূহের জন্য স্বীকার করে না। মুসলিম বিশ্বে তারা আধিপত্য কায়েম করার জন্য সর্বত্র মানবাধিকারকে পদদলিত করে চলেছে।

সকল অশান্তি, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-দুর্দশার আসল কারণই হলো মানবাধিকার থেকে বঞ্চনা। প্রকৃত বিশ্লেষণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসনই ঐ বঞ্চনার জন্য দায়ী। কুরআন থেকে এ মহাশিক্ষাই লাভ করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করেন। তাই আমরা নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, মানবসমাজে মানবাধিকার বহাল করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আর কিতাব ও মীযানের মাধ্যমেই মানবাধিকার নির্ণয় করা হয়েছে।

কিতাব ও মীযান কীভাবে কায়েম হবে?

আল্লাহ তাআলা যে কিতাব ও মীযান নাযিল করলেন, তা বাস্তবে কায়েম হলে মানুষ কিস্ত-এর উপর দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে; কিন্তু কিতাব ও মীযান কি আপনা-আপনিই কায়েম হয়ে যাবে? আল্লাহ যে আইন ও মানবাধিকার নাযিল করলেন, তা কীভাবে কার্যকর হবে?

কোনো আইনই নিজে নিজে জারি হতে পারে না। আইন প্রয়োগকারী শক্তির প্রয়োজন। Law anforcing authority ছাড়া আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ঐ শক্তির কথাই আয়াতের পরবর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

কিতাব ও মীযান নাযিলের পর পরই লোহা নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। এর আগে মীযান নাযিলের কথা আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, মীযান মানে বস্তু দাঁড়িপাল্লা নয়। তেমনি এখানেও লোহা দ্বারা বস্তু লোহা বোঝায় না।

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বস্তু লোহা অবশ্যই সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু এ আয়াতে লোহা দ্বারা বস্তু লোহা বোঝানো হয়নি। কিতাব ও মীযানের সাথে বস্তু লোহার কী সম্পর্ক? তাছাড়া যত রাসূল পাঠানো হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সাথেই কি বস্তু লোহা পাঠিয়েছেন? এখানে লোহা মানে Authority বা শাসনশক্তি। কুরআনে শাসনক্ষমতাকে 'সুলতান'ও বলা হয়েছে।

আরবীতে সুলতান মানে বাদশাহ নয়; উর্দু ও ফারসি ভাষায় বাদশাহকে সুলতান বলা হয়। সুলতান মানে শাসনশক্তি। লোহা শক্তির প্রতীক। মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র) তার তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে লোহা মানে রণশক্তি লিখেছেন। অস্ত্রশস্ত্র লোহা দিয়েই তৈরি হয় বলে এর দ্বারা সামরিক শক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকে, তারাই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। তাই এখানে লোহা মানে শাসনক্ষমতা।

শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা কিতাব ও মীযানের সাথে শাসনক্ষমতাও নাযিল করেছেন।

শাসনক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

ঐ আয়াতে লোহা নাযিল করেছি বলার পর বলা হয়েছে যে, লোহার মধ্যে একদিকে রয়েছে, بَأْسٌ شَدِيْدٌ এবং অপরদিকে রয়েছে مَنَافِعُ لِلنَّاسِ।

بَأْسٌ শব্দটি কুরআনের বহু আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও আপদ-বিপদ, কোথাও আযাব বা শাস্তি, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও কঠোরতা অর্থে এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। بَأْسٌ شَدِيْدٌ মানে বিরাট শক্তি বা কঠোর ক্ষমতা। শাসনক্ষমতা জনগণের জন্য মহা বিপদের কারণও হতে পারে। অত্যাচারী শাসকের হাতে মানুষ চরম দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে থাকে। অপরদিকে শাসনক্ষমতা যদি সৎ লোকের হাতে থাকে, তাহলে মানুষ বহু কল্যাণ লাভ করে।

আয়াতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, শাসনক্ষমতা যদি কিতাব ও মীযান অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা জনগণের জন্য শুধু কল্যাণকরই হয়ে থাকে। আর যদি কিতাব ও মীযানকে অগ্রাহ্য করে মনগড়া আইন চালু করা হয়, তাহলে শুধু মুসীবতই জনগণকে সহ্য করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনেই শাসনক্ষমতা নাযিল করেছেন। এ ক্ষমতা আল্লাহর আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করা হলে জনগণের জন্য তা অবশ্যই মঙ্গল। কিন্তু শাসকরা যদি

www.amarboi.org

নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী শাসনশক্তি ব্যবহার করে তাহলে দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকে না।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) তাঁর রচিত খুতবাতুল আহকামের দ্বিতীয় খুতবায় একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন,

اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ـ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ اَهَانَ اللّٰهَ ـ

'শাসনশক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া। যে আল্লাহর এ ক্ষমতাকে অপমান করে, আল্লাহ তাকে অপমান করেন।'

আমি মাওলানা মওদূদী (র)-কে এ হাদীসের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আসল ক্ষমতা তো আল্লাহরই হাতে। মানবসমাজে যে শাসনক্ষমতা রয়েছে, তা ঐ ক্ষমতার ছায়া মাত্র। যে এ ক্ষমতার মর্যাদা রক্ষা না করে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সে এ ক্ষমতার অপমান করল। আর এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ অবশ্যই অপমান করবেন।'

বিশ্বে মানবাধিকারের বাস্তব অবস্থা কী?

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে আধুনিক যুগের মানুষ সভ্যতার অগ্রগতি নিয়ে গৌরববোধ করে। বস্তুগত সুখ-সুবিধা ভোগের সীমাহীন উপাদান সহজলভ্য হয়েছে। পূর্বে রাজা-বাদশাহরাও যেসব বস্তুগত আরামের ব্যবস্থা করতে পারেনি, বর্তমানে সচ্ছল লোকেরা সেসব উপভোগ করছে। এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মানুষ সত্যিই অনেক উন্নতি করেছে।

কিন্তু মানবাধিকার ভোগ করার হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, অতীতে কোনো কালেই মানুষের হাতে মানুষ এত নির্যাতন ভোগ করেনি। মানুষ আজ স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার থেকেও বঞ্চিত। জীবনের কোনো নিরাপত্তাই নেই। পিস্তল আবিষ্কারের পূর্বে কোনো লোককে হঠাৎ কাপুরুষের মতো গুলি করে মেরে ফেলা যেত না। আণবিক বোমা তৈরির পূর্বে এক মুহূর্তে লাখ লাখ মানুষ হত্যা করা সম্ভব ছিল না। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি অসৎ মানুষকে বিরাট ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

আল্লাহর কিতাব ও মীযান অনুযায়ী মুহাম্মদ (স)-এর যুগে বর্বর আরববাসীকে সভ্যতার পতাকাবাহীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। তারা গোটা বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অভিযান চালিয়ে উন্নততর আদর্শ স্থাপন করেছেন। এটা প্রাগৈতিহাসিক গল্প বা পৌরানিক কাহিনী নয়। তাঁরা মাত্র দেড় হাজার বছর পূর্বে ঐতিহাসিক যুগে রোম ও পারস্য সভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত সভ্যসমাজ মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন। শাসনক্ষমতা কিতাব ও মীযান অনুযায়ী ব্যবহার করার ফলেই এমন অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হয়েছে।

www.amarboi.org

আজ যারা বিশ্বে পরাশক্তির অধিকারী তারা সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার পদদলিত করছে। তারা কিতাব ও মীযানের ধার ধারে না। তাদের হাতে পশুশক্তি রয়েছে, যা তারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। যারা কিতাব ও মীযানে বিশ্বাসী তারা যদি রাসূল (স)-এর আদর্শ অনুকরণ করে এ পরাশক্তির গলায় লাগাম লাগাতে না পারে তাহলে মানবজাতির দুর্গতি ও দুর্দশা অবসানের কোনো উপায় নেই।

সব রাসূলের যুগে কেন কিস্‌ত কায়েম হয়নি

আল্লাহ তাআলা কোনো অযোগ্য লোককে রাসূল নিয়োগ করেননি। যে রাসূলের যুগে কিতাব ও মীযান অনুযায়ী জনগণ কিস্‌তের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পায়নি, সে জন্য রাসূল দায়ী নন। এ কাজটি এমন যে, রাসূল যত যোগ্যই হোন, তাঁর একার পক্ষে তা সমাধা করা সম্ভব নয়। একদল সৎ ও যোগ্য লোকের সহযোগিতা ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের মতো বিরাট কাজ সমাধা হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা রাসূলকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন; কিন্তু এ দাওয়াত কবুল করার জন্য জনগণকে বাধ্য করার ক্ষমতা দেননি। তিনি জনগণকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, তারা দাওয়াতে সাড়া নাও দিতে পারে। তাই যে রাসূলের যুগে রাসূলের সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক জোগাড় হয়নি, সে রাসূলের যুগে সাফল্যও আসেনি।

সাফল্য লাভের জন্য দুটো শর্ত

আল্লাহর কিতাব ও মীযানের প্রতি যারা ঈমান আনার দাবিদার, তারা যদি প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী হন তাহলে প্রথম শর্তটি পূরণ হলো। সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ

'তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তাদের আগের লোকদেরকে বানিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় শর্তটি হলো, যে দেশে কিতাব ও মীযানকে কায়েম করার চেষ্টা চলে, সে দেশের জনগণ যদি এর সক্রিয় বিরোধী না হয় তাহলে সফল হওয়া সম্ভব। রাসূল (স)-এর যুগে মক্কায় থাকাকালেই প্রথম শর্তটি পূরণ হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি সেখানে পাওয়া যায়নি। এ শর্তটি মদীনায় পাওয়া যাওয়ায় সেখানে সাফল্যও আসে।

বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে দ্বিতীয় শর্তটি উপস্থিত আছে। প্রথম শর্তটি পূরণ হলেই বাংলাদেশে কিতাব ও মীযান অনুযায়ী মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব। এ শর্তটি পূরণের

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যে কতক সংগঠন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সকল আলেম ও দীনদার লোকদেরই এ প্রচেষ্টায় শরীক হওয়া কর্তব্য।

আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা

সূরা হাদীদের আলোচ্য ২৫ নং আয়াতটির শেষাংশের অনুবাদ হলো, 'এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী।'

আয়াতের এ অংশে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা বলতে চান, তা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সহজ-সরল কথায় আল্লাহর বক্তব্য নিম্নরূপ :

'জনগণ যাতে তাদের যাবতীয় অধিকার পেয়ে কিস্তের উপর কায়েম হয়ে যেতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে কিতাব ও মীযানসহ পাঠালাম এবং তা বাস্তবায়নের জন্য শাসনশক্তি নাযিল করলাম। আমি যদি নিজেই তা বাস্তবায়ন করতে চাইতাম তাহলে রাসূল পাঠাতাম না। কারণ, গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য আমি যে বিধান রচনা করেছি, তা আমি নিজেই বাস্তবায়ন করি। আর মানবসমাজের জন্য রচিত বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমি নিজে পালন না করে আমার পক্ষ থেকে সে দায়িত্ব পালনের জন্যই রাসূল পাঠিয়েছি।

'আমি দেখে নিতে চাই, কারা আমাকে না দেখেও আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। আমি কারো সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নই। এ কাজটি আমি নিজে না করে রাসূলের উপর এর দায়িত্ব দিয়েছি। এ কাজে রাসূলের সাহায্য ও সহযোগিতা করা প্রয়োজন। কারণ এ কাজটি রাসূলের পক্ষে একা সমাধা করা সম্ভব নয়।

'আমি দেখতে চাই, যারা ঈমানদার হওয়ার দাবি করে, বিশেষ করে যারা আমার কিতাবের ইলম হাসিল করে, তারা এ কঠিন দায়িত্বটি পালন করে কি না।'

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী জনগণকে কিস্তের উপর কায়েম হওয়ার সুযোগ দান করার জন্য আলেম ও দীনদারদের অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য কেমন করে হাসিল করা সম্ভব হবে?

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কিস্ত-এর উপর কায়েম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সমাপ্ত

www.amarboi.org

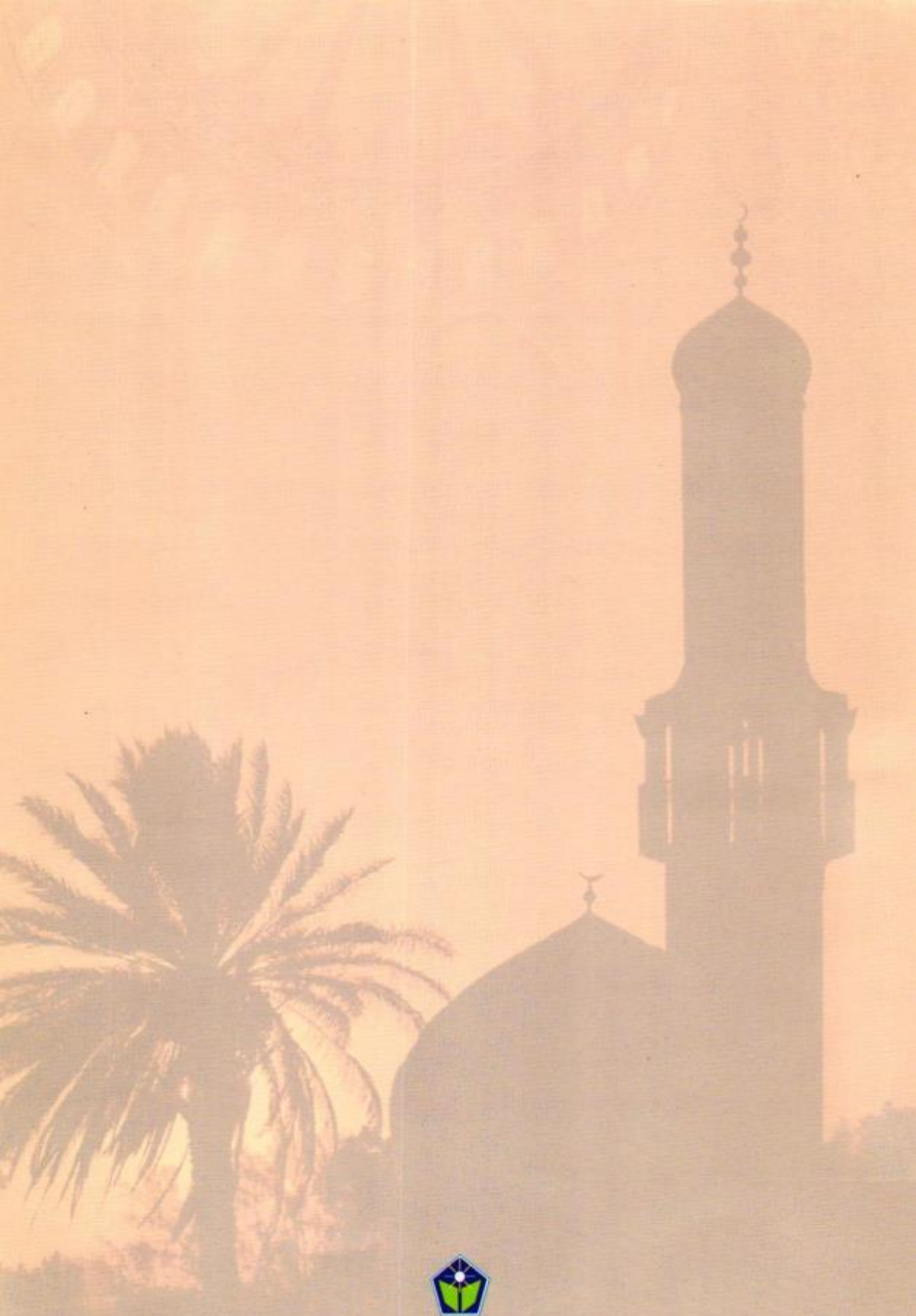

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com